বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব
(Critical Theory)

বাসবী চক্রবর্তী

সমাজবিদ্যার আধুনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব (Critical Theory) প্রকৃতপ্রস্তাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একাধিক জার্মান সমাজবিজ্ঞানীদের বৌদ্ধিক অবদানে সমৃদ্ধ হল আলোচ্য তত্ত্ব। উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞানীদের প্রাবন্ধিক অনুপ্রেরণা ছিল প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের (Karl Marx) তত্ত্ব ও ভাবনা। মার্কসের মতো একই ধারায় এরা সমাজের প্রচলিত কাঠামোকে সমালোচনা করেছেন এবং নিজেদের মৌলিক ভাবনার মাধ্যমে একে বিশ্লেষণ করেছেন বলে এই তত্ত্বকে বলা হয় বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব (Critical Theory)।

বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট (Intellectual and Social Background)

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় সমভাবে উচ্চারিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের (Frankfurt School) নাম। কিন্তু কীভাবে আলোচ্য তত্ত্বের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সংযোগ গড়ে উঠল তা জানতে গেলে আমাদের অনুধাবন করা দরকার জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ' নামক গবেষণা কেন্দ্রটির উদ্ভব প্রেক্ষাপটকে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সূচনা হয় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে, ১৯২৩ সালে 'ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার জন্যে অর্থানুকূল্য এসেছিল প্রতিষ্ঠানেরই একজন সদস্য ফেলিক্স ওয়েল (Felix Weil) এবং তাঁর ধনী পিতার কাছ থেকে। মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি যদিও ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি বিভাগ ছিল— কিন্তু অর্থনৈতিক সাহায্যের উৎস ছিল

পুনরায় সংজ্ঞা দান করা। (খ) চিরাচরিত ও গোঁড়া মার্কসবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গ্রহণ না করে মার্কসের ভাবনার পুনর্নির্মাণ করা এবং (গ) সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সচেতনতার রূপান্তরের সুযোগকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নতুন সামাজিক তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্বিষয়ক সম্পর্ককে নতুনভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

উল্লেখ্য যে, ফ্রাঙ্কফুর্টের স্কুলের বিকাশে ১৯৪০-র দশকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের ফলশ্রুতিতে 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৩৩ সালে প্রথমে জেনিভায় এবং পরে ১৯৩৫ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে হয়। কিন্তু এইসব অন্তরায়ের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁদের গবেষণা বিরামহীনভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। শুধু তাই নয়, এইসব গবেষকদের ভাবনা ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠানের নতুন পত্রিকা *Journal of Social Research* ও *Studies in Philosophy and Social Science*-এ প্রকাশিত হতে থাকে। তবে ১৯৪০ এর দশকের পরবর্তী সময়ে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল— বিশেষ করে আর্থিক সমস্যায়। প্রতিষ্ঠানে গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। 'Studies in Philosophy and Social Science' নামক প্রকল্পটিকেও বজায় রাখা সম্ভব হয়নি (১৯৪১)। জার্মানি ছেড়ে অন্য দেশে বাধ্য হয়ে চলে আসা, নতুন ধরনের পাঠকদের সম্মুখীন হওয়া এবং আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়া— এইসব কারণগুলিই শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকা পরিবর্তনের একমাত্র কারণ ছিল না। এর পাশাপাশি কিছু বৌদ্ধিক সমস্যাও দেখা গিয়েছিল। হর্কহেইমারের মতে, ১৯৩০ এর দশকে যে-সমস্ত ধারণা ও ভাবনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা চালানো হয়েছিল— তা ১৯৪০ এর দশকে আর তত প্রাসঙ্গিক ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের আগে মানুষের মনে যে আশাবাদ দেখা দিয়েছিল— তা ক্রমশ হ্রাস পায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকদের ধ্যানধারণাও সাধারণ মানুষের ওপর তেমন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতেও ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এই দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষণা কর্মের বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ছিল লক্ষণীয়। যেমন— পুঁজিবাদ বিষয়ক তত্ত্বসমূহ, যান্ত্রিক যুক্তিবিদ্যার উদ্ভব, সংস্কৃতি, কারখানা ও গণ সংস্কৃতি (Culture, Industry and Mass Culture) বিষয়ক ব্যাখ্যা, পরিবারের কাঠামো ও ব্যক্তি মানুষের বিকাশের সম্পর্ক এবং আলোকায়নের দ্বান্দ্বিকতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর হর্কহেইমার ও অ্যাডোর্নো আমেরিকা থেকে জার্মানিতে ফিরে আসেন। তবে হার্বার্ট মার্কিউস ও এরিক ফ্রম আমেরিকাতেই থেকে যান। ১৯৫৩ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টেই আবার এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সময়কালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জার্মানির বৌদ্ধিক জগতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৬ সালের পর ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হতে থাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ভাবনাচিন্তা। উল্লেখ্য যে, ১৯৬০-এর দশকে সংস্কারবাদী ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হবার ভাবনার উৎস হিসাবেও আলোচ্য স্কুলের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ১৯৫৫ সালে থিয়োডর অ্যাডোর্নো 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চে'র সহ-পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানের পুরোনো পত্রিকা *Journal of Social Research*-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলেও *Frankfurt Contributum to Sociology* শিরোনামে একটি জার্নাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। হর্কহেইমার ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে অ্যাডোর্নো এবং ১৯৭৩ সালে হর্কহেইমার প্রয়াত হন।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে বৌদ্ধিক পরম্পরার বিচারে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ছিল অবশ্যই একটি মার্কসবাদী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণে রাখা দরকার যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষকরা শুধু মার্কসীয় উত্তরাধিকারের বাহক ছিলেন না, এর পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বুর্জোয়া-বিরোধী জটিল পরম্পরার সামগ্রিক উত্তরাধিকারকেও তারা বহন করতেন। আগেই বলা হয়েছে যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত গবেষকদের বৌদ্ধিক তত্ত্বভাবনাকে 'Critical Theory' বা 'বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব' বলা হয়। বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো বৈষম্য নেই অর্থাৎ তারা প্রকৃতিগতভাবে সমান। কিন্তু 'Instrumental Logic' বা যান্ত্রিক যুক্তিবিদ্যার নামে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যে সাম্য নির্মাণের প্রচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধে এই তাত্ত্বিকেরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুতরাং যদি এদিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে বলতে হবে যে, বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা প্রচলিত বামপন্থী ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে একটি নতুন ধরনের 'মার্কসবাদী পরম্পরা' নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছিলেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪)। জর্জ লুকাচ এবং বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরাই প্রথম 'Mass Culture' বা গণসংস্কৃতির সমালোচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকেরা নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থান থেকে যুক্তির গুণাবলি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং যুক্তিবিদ্যার (logic) পদ্ধতি দ্বারা কোন শ্রেণি ও সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থসাধন হচ্ছে— সেই

বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন। এই সংশয় প্রকাশের ফলশ্রুতিতে আবশ্যিকভাবে ইতিহাসের 'Unilinea' বা একরৈখিক প্রগতি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা বিষয়েও সংশয় বা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা আধুনিকতা, যান্ত্রিক যুক্তিবিদ্যা এবং আলোকায়নের সমালোচনা করেছেন এবং সেই সূত্র ধরেই যুক্তির সেই বিশেষ রূপটাকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন— যা পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের অনুকূলে সমর্থন জানিয়েছে এবং এদের বৈধতা দানের জন্যে সচেষ্ট হয়েছে।

সংস্কৃতির কারখানা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমালোচনা (Culture Industry : Critique of Frankfurt School)

বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা সমাজে সংস্কৃতির ধারণা ও ভূমিকাকে পূর্ণতত্ত্বায়ন করতে চেয়েছিলেন— যার সূচনা হয়েছিল সাবেকি মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনার মাধ্যমে। মার্কসীয় তত্ত্বের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী প্রাধান্যকেও সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করার কারণে সামাজিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্বে— ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণায়— ভিত্তি (base) এবং উপরি কাঠামোর (Superstructure) কথা বলা হয়েছে; সমাজের রাজনৈতিক-আইনি-সাংস্কৃতিক দিকগুলি নিয়ে গড়ে ওঠা উপরি কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি (উৎপাদনের পদ্ধতি)— মার্কসীয় এই ভাবনাকে বলা হয়েছে অতি সরলীকৃত ধারণা ও যান্ত্রিক। এর পরিবর্তে বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা আমাদের নির্দেশ করেছেন যে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে কীভাবে মূল অর্থনীতির ওপরে চলচ্চিত্র, বেতার ইত্যাদির মতো বিনোদনের উপাদানগুলি আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এর ফলশ্রুতিতে 'সংস্কৃতি' আর শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন হিসেবে কাজ করছে না, বরং নিজেই একটি 'কারখানা' (industry) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। সংস্কৃতি কারখানা নিজে এবং যারা একে অধিগ্রহণ করছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে— সবাই-ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ। ফলে সমাজে মানুষের মন ও চিন্তাভাবনার ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা অর্জন করে সংস্কৃতি কারখানা এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থাগুলি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে মানুষকে অবদমিত রাখার কাজে সংস্কৃতি কারখানার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ— যা নির্দেশ করে অর্থনৈতিক শক্তির তুলনায় সংস্কৃতির প্রভাবের ক্ষমতাকে।

শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা-নির্ভর মতাদর্শ (ideology) প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এই নিষ্ক্রিয় ভোক্তা-দর্শকের ওপর। এখানে উল্লেখ্য, হর্কহেইমার ও অ্যাডোর্নোর ভাবনার সঙ্গে প্রচলিত মার্কসবাদী ধ্যানধারণার পার্থক্য লক্ষণীয়। মার্কসবাদী তত্ত্বে ভিত্তি হিসেবে পরিচিত 'Political economy' বা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র প্রাধান্যকে অনেকটাই হ্রাস করে দিয়েছিল 'সংস্কৃতি-কারখানা' বিষয়ক ভাবনা, বরং অপরদিকে প্রাধান্য পেয়েছিল Super-structure বা উপরি-কাঠামোর স্বাধীন ধ্যানধারণা। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সংস্কৃতির ওপর পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ, সংস্কৃতির মতাদর্শগত সক্রিয়তা, সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ এবং 'Reification' বা 'বিমূর্তের মূর্তকরণ' প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা— এই বিষয়গুলি মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পর্কিত। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ কীভাবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে অন্বিত হয়, তা বোঝা সহজসাধ্য। আর এই সূত্রেই বলা যায়, ব্যক্তিমানুষ পুঁজিবাদের ঘেরাটোপে কীভাবে সাহায্য পায় তথাকথিত 'সংস্কৃতি কারখানা' থেকে।

হর্কহেইমার ও অ্যাডোর্নো প্রচলিত মার্কসবাদী ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই পুঁজিবাদ ও সংস্কৃতি কারখানার সংযোগকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকদের মতে, যে সামাজিক তত্ত্ব, নিজেই পুঁজিবাদী-বিষয়ক তত্ত্বের অংশ, তার শর্তেই সমস্ত সামাজিক ঘটনাগুলিকে (social phenomena) অনুধাবন করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি, সংস্কৃতি কারখানার মতো বিষয়কে বোঝার জন্যেও দরকার হল সমাজ এবং অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝা। প্রকৃতপ্রস্তাবে, বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকেরা সমাজবিষয়ক তত্ত্ব এং বিশ্লেষণের বিষয়— এই দুইয়ের 'dialectics' বা দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। *Dialectic of Enlightenment* গ্রন্থে হর্কহেইমার ও অ্যাডোর্নো বোঝাতে চেয়েছেন যে অন্যান্য কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি আসলে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র কিছু নয়, কারণ সাংস্কৃতিক উৎপাদন পদ্ধতি যে উৎপাদন করে— তা সামগ্রিকভাবে 'formalized' বা 'প্রকরণনির্ভর'। এই উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালিত হয় যুক্তি-আশ্রয়ী (rationalized) এবং সংগঠিত (organized) পদ্ধতিতে এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা ও মুনাফা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, সংস্কৃতি উৎপাদন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে আবদ্ধ এবং বারবার নিজেকে একইভাবে উপস্থাপন করে (পুনরাবৃত্তিমূলক)। সংস্কৃতি উৎপাদনের এই চরিত্রটিকে গ্রহণযোগ্য ও স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে হর্কহেইমার ও অ্যাডোর্নো একটি রূপককে (metaphor) বার বার ব্যবহৃত

থাকলেও তিনি এই বিষয়ে যথাযথভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে এই বিষয়ে অনেক বেশি জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন থিয়োডোর অ্যাডোর্নো। যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যাডোর্নো তাঁর তাত্ত্বিক ভাবনাকে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিকদের অবদান (Contribution of Critical Theorists)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব তাত্ত্বিকদের বৌদ্ধিক অবদান বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ম্যাক্স হর্কহেইমার, থিয়োডোর অ্যাডোর্নো, হার্বার্ট মারকিউস। পরবর্তীকালে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন য়ুরগেন হেবারমাস। তবে আলোচনার এই পরিসরের সূচনা হবে 'জর্জ লুকাচে'র (George Lukacs) অবদান উল্লেখ করে, কারণ ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিকভাবে লুকাচ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মার্কসবাদকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

জর্জ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১)

লুকাচের প্রধান কৃতিত্ব হল মার্কসীয় ভাবনাকে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের (economic determinism) দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়াস। এই বিষয়ে তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের হেগেলিয় উৎসগুলিকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, সামগ্রিকভাবে মার্কসের তত্ত্বভাবনাকে দুটি সময়কালে ভাগ করে আলোচনা করা সংগত— তরুণ বয়সের মার্কসের ভাবনা এবং পরিণত বয়সের মার্কসীয় ভাবনা। মার্কসের পরবর্তী জীবনের অর্থনৈতিক কাজগুলিকে শুধু না পড়ে, কেউ যদি ১৮৪৪ সালে লেখা মার্কসের *The Economic and Philosophical Manuscript* নামক রচনাটি পড়েন, তাহলে তার পক্ষে মার্কসবাদকে ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। লুকাচ নিজে তা করেছেন এবং একজন হেগেলিয় মার্কসবাদী হিসেবে সমাজের বিষয়ীগত (subjective) এবং বিষয়গত (objective) ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বান্দ্বিকতাকে লক্ষ করার চেষ্টা করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট-স্কুল এর প্রস্তুতির পর্বে লুকাচের চিন্তা-ভাবনা অধিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানে উল্লেখ্য ১৯২৩ সালে লেখা *History and Class Consciousness* গ্রন্থটি, যেখানে তিনি ভোগ্যপণ্য ও বিমূর্তের মূর্তকরণ

(Reification) সম্পর্কে মার্কসের নিজস্ব ভাবনার বিষয়ীগত দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। লুকাচের মতে, শ্রেণি-সচেতনতা কোনো বস্তুগত অবস্থার (material condition) স্বয়ংক্রিয় রূপ নয়, বরং এই সচেতনতা নির্ভর করে প্রলেতারিয়েতদের স্বাধীন কাজকর্মের ওপরে। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি শুধুমাত্র বস্তুগত অবস্থার কোনো স্বয়ংক্রিয় ফলশ্রুতি নয়। আলোচ্য গ্রন্থে লুকাচ পুঁজিবাদী সমাজে ভোগ্যপণ্যের মূল গুরুত্বকে পুনরায় পরীক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 'Reification' বা 'বিমূর্তের মূর্তকরণ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সামাজিক তত্ত্বের অগ্রভাগে মতাদর্শের (ideology) বিষয়টিকে স্থাপন করেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে, আধুনিক সমাজে মতাদর্শের প্রাধান্যকারী ভূমিকার ওপরে বিশ্লেষণমূলক গোষ্ঠীর গুরুত্বদানের জন্যে লুকাচের তত্ত্বের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

কার্ল মার্কস 'fetishism of commodities' বা 'ভোগ্যপণ্যের বস্তুকাম' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন, যেখানে উৎপাদনকারী ধারণা করতে পারে যে, উৎপাদিত দ্রব্যের একটি নিজস্ব বস্তুগত বাস্তবতা আছে। কিন্তু এই ভোগ্যপণ্যের সত্যিকারের উৎপাদক যে তারাই, সেই বিষয়টি তাদের নজরের বাইরে চলে যায়। এইভাবে ভোগ্যপণ্যের মূল্যের প্রকৃত স্রষ্টা হিসেবে তাদের ভূমিকাকে চিনতে তারা নিজেরাই ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে, এই মূল্যকে 'ভাবা হয় বাজারের উৎপাদনের নিরিখে। মার্কসের তত্ত্বায়িত ভোগ্যপণ্যের এই বস্তুকাম-নির্ভর (fetish) চরিত্র থেকে লুকাচ 'reification' বা 'বিমূর্তের মূর্তকরণ' বিষয়ে নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, এই বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। পুঁজিবাদের অধীনে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এই মূর্ত অস্তিত্বের দ্বারা চিহ্নিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রকৃত ফলশ্রুতি হিসেবে উদ্ভূত সমাজ কাঠামো 'বস্তুগত বাস্তবতা' নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে, যখন সমাজস্থ মানুষ নিজেই উপলব্ধি করতে পারে যে এই কাঠামোর অস্তিত্বেরও একটি নিজস্ব যুক্তিবোধ আছে।

'বিমূর্তের মূর্তকরণ' বিষয়ে লুকাচের ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজগুলির অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছে বিশেষ করে। গোঁড়া মার্কসীয় তত্ত্বের সংকটও নির্দেশ করতে চেয়েছে এই ধারণা, কারণ এই গোঁড়া মার্কসবাদ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাঙ্গেরি, জার্মানি, ইতালি ও অষ্ট্রিয়ার ব্যর্থ বিপ্লবাত্মক আন্দোলন এবং তার পাশাপাশি রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির একরৈখিক প্রবণতা (মার্কসবাদকে একটি চিন্তা ও প্রয়োগের বদ্ধ

ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা) শ্রেণি সচেতনতার মার্কসীয় তত্ত্বের মূল দার্শনিক প্রতিপাদ্যকে পুনর্বার ব্যাখ্যা করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে.

অন্যভাবে বলা যায়, মার্কসবাদের একটি নির্ধারণবাদী রূপের বিরুদ্ধে লুকাচ মার্কসবাদের একটি আত্ম-প্রতিবর্তীয় (self-reflexive) রূপকে অন্বেষণ করেছেন। বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকেও, সংগ্রামের মতাদর্শগত ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি, কর্ম ও বিষয়ীগত ভাবনার ওপর জোর দিয়ে লুকাচ একটি 'প্রয়োগের দর্শনের' (Philosophy of Praxis) প্রস্তাব দিয়েছেন। গোঁড়া মার্কসীয় অবস্থানের বিপরীত দিকে এই 'প্রয়োগের দর্শনের' অবস্থান। মনে রাখতে হবে, গোঁড়া মার্কসীয় ধারণা 'অর্থনৈতিক নীতি' (economic laws) এবং বিষয়গত সামাজিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। এর পরিবর্তে, প্রয়োগের দর্শন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যকে বা সংহতিকে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী। Kellner (1989)-এর মতে, এটি হচ্ছে অনেক বেশি কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গি— যা মানুষের বিষয়ীগত ভাবনাকে ইতিহাস গড়ে তোলার কেন্দ্রে স্থাপন করতে চায়।

ম্যাক্স হর্কহেইমার (১৮৯৫-১৯৭৩)

ম্যাক্স হর্কহেইমার ছিলেন প্রধানত একজন জার্মান দার্শনিক। ১৯২২ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের (Immanuel Kant) দর্শন-ভাবনা। ১৯২৫ সালে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং প্রভাষক (lecturer) হিসেবে 'ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ' এ যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদে যোগ দেন এবং গবেষণা ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি আন্তর্বিষয়ক (Interdisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সমর্থক ছিলেন। তিনি সামাজিক তত্ত্বের কাঠামো নির্মাণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিবিদ্যাগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে দর্শনের প্রতিবর্তীয় ক্ষমতার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। জার্মানিতে নাৎসি আক্রমণের কারণে হর্কহেইমার গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য গবেষকদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে বাধ্য হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি মার্কিনি সরকারের হয়ে কাজ করার জন্যে ওয়াশিংটন যাননি। জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন রুশ বিপ্লবের একজন সংবেদনশীল সমর্থক, কিন্তু তিনি

কখনোই সোভিয়েত কমিউনিজমের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না অর্থাৎ সমালোচনার মতো পরিসর তৈরি হলে, তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার মতো ঘটনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন বিপর্যয় এবং তার পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোগবাদী সমাজের (consumer society) উদ্ভব— এই সমস্ত কিছুই হর্কহেইমারের চিন্তা প্রক্রিয়াকে গড়ে তুলেছিল এবং তাত্ত্বিক কাজকর্মের প্রতি তাঁকে দায়বদ্ধ করেছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে হর্কহেইমার ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হন (১৯৫৩ সালে)। তিনি ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে হর্কহেইমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত গড়ে উঠেছিল হর্কহেইমারের চিন্তাভাবনা থেকে। ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত জার্নালের বিভিন্ন রচনায় হর্কহেইমারের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকের রচনায় হর্কহেইমার যথেষ্ট পরিমাণে মার্কসীয় দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। পরবর্তীকালে হর্কহেইমারের রচনায় অনেক বেশি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়— যেখানে তিনি নিজস্ব ভাবনার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। হর্কহেইমারের কাছে আকর্ষণের বিষয় ছিল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। তিনি সামাজিক দর্শনকে মানুষের সমাজের ভবিতব্যের 'ব্যাখ্যা' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস করেছিলেন। হর্কহেইমার একদিকে যেমন সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনের ভিত্তি ও সাংস্কৃতিক অর্থের অন্বয়ের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে তোলা সামাজিক দর্শনের প্রথাগত প্রশ্নের গুরুত্বকে মেনে নিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে এইসব বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিশুদ্ধ দার্শনিক অবস্থান নেওয়াকেও তিনি মন থেকে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি দার্শনিকদের অবস্থান অত্যন্ত বিমূর্ত (abstract) এবং তা সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি এক্ষেত্রে হেগেলিয় (Hegelian) ভাববাদী (idealistic) অবস্থানকে সমর্থন করেননি। তিনি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির অনুশীলনের (praxis) অন্তর্বর্তী উপলব্ধিগুলি ও তাদের বিকাশের দ্বান্দ্বিকতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণ নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কেও হর্কহেইমার অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সালের মধ্যে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সম্ভাবনা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেবল টিকে

থাকতে পারে বুর্জোয়া গণতন্ত্র দ্বারা গড়ে ওঠা স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে। পুঁজিবাদ সমাজে নানা ধরনের সংকটের জন্ম দিয়েছে— যার মধ্যে অন্যতম হল ফ্যাসিবাদ (Facism)। ফ্যাসিবাদকে পুঁজিবাদের যুক্তিসিদ্ধ ও স্বাভাবিক ফলশ্রুতি বলা যায়। হর্কহেইমারের মতে, যে সমস্ত মানুষ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলতে রাজি নন, তাদের ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গেও মৌন থাকা উচিত। হর্কহেইমার বলেছেন যে ফ্যাসিবাদকে নির্দেশ করার জন্যে মার্কসবাদের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন নেই, কারণ আধিপত্যের প্রকরণের মধ্যেই কিছু পরিবর্তন এসেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪)। পুঁজিবাদ প্রাথমিকভাবে যখন বিকাশলাভ করছিল, তখন একটি বড়ো সংখ্যক মানুষকে কর্মহীন অবস্থায় পাওয়া যেত। ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকারীরা (agitator) এইসব কর্মহীন মানুষদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত করে তুলত। হর্কহেইমারের মতে, 'Late capitalism' বা পুঁজিবাদের বিলম্বিত পর্বে মানুষের চৈতন্যকে এমনভাবে পুনরায় গড়ে তোলা দরকার যে, তাদের যে কোনো সামাজিক ও সামরিক প্রয়োজনে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। এভাবেই নতুন প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠিত শাসকশ্রেণির হাতে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য, পুঁজিবাদের বিলম্বিত পর্যায়ে প্রশাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিন্যাস-কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এই পরিবর্তনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— বৃহদায়তন আমলাতন্ত্রের (bureaucracy) উদ্ভব।

হর্কহেইমারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *Eclipse of Reason* প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে প্রকাশিত দর্শনের ইতিহাসে যুক্তির ধারণার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। হর্কহেইমারের মতে, এই যুক্তির ধারণা শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারাতেই গড়ে উঠতে পারে। হর্কহেইমার এই গ্রন্থে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরে, ফ্যাসিবাদের পতনের পরেও— তার পুনরায় আবির্ভাবের ভয় কেন যে থেকে যাচ্ছে তাকেও বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান যুগ হচ্ছে 'objective' বা বিষয়গত যুক্তির দীপ্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হবার যুগ। সেই কারণেই 'subjective' বা 'বিষয়ীগত' যুক্তি এবং 'objective' বা 'বিষয়গত যুক্তি'র মধ্যে ফারাক (difference) নির্দেশ করা জরুরি হয়ে উঠেছে। বিষয়ীগত যুক্তি (subjective reason) 'end and means' অর্থাৎ 'লক্ষ্য ও পদ্ধতির' মধ্যে সম্ভাব্য বোঝাপড়ার প্রতি প্রাধান্য দেয়। নয়া-দৃষ্টবাদী (neo-positivist) ধ্যানধারণা পোষণ করেন যে সব তাত্ত্বিকেরা, তারা বি[illegible]ক্তির

থিয়োডোর অ্যাডোর্নো (১৯০৩-১৯৬৯)

থিয়োডোর অ্যাডোর্নো জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী পরিবার। অ্যাডোর্নো ছিলেন দর্শনের ছাত্র এবং তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল হুসারল (Husserl)-এর প্রপঞ্চবাদী চিন্তা (Phenomenology)। ১৯২৪ সালে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর সহযোগী গবেষক হিসেবে তিনি 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ' এ যোগদান করেন। তাঁর সহযোগী হর্কহেইমারের মতো তাঁকেও নাৎসি আক্রমণের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে হয়েছিল। অ্যাডোর্নো বিশ্লেষণমূলক চিন্তার তাত্ত্বিক কারণগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হর্কহেইমারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তবে অ্যাডোর্নো ছিলেন অনেক বেশি দার্শনিক-মনস্ক এবং তাঁর চিন্তাধারা ছিল গবেষণা-প্রসূত ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় অ্যাডোর্নো *Minima Moralia* নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ছিল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সাল, যেখানে তিনি জানিয়েছেন যে সামাজিক জীবনের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধিৎসার উৎস হচ্ছে একজন 'অভিবাসী বুদ্ধিজীবী'র (intellectual in emigration) নিজস্ব সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা। একজন ইউরোপীয় উদ্বাস্তুর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অ্যাডোর্নো সমসাময়িক পুঁজিবাদের অভিনব অবস্থা দেখেছিলেন এবং লক্ষ করেছিলেন যে পুঁজিবাদের গোড়া পূর্ব অবস্থা থেকে কতটা আলাদা। এই উপলব্ধি অ্যাডোর্নোর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সমাজ-কাঠামো বা পুঁজিবাদকে অনুধাবন করার চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন ভাবে বোঝার ক্ষমতা। এইভাবে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন 'সামাজিক সচেতনার বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' (critical social consciousness), যার উদ্দেশ্য হল দেখানো কীভাবে দর্শন বিষয়গত কাঠামোকে মূর্ত করে তোলে। অ্যাডোর্নোর মতে, অনুরূপভাবে শিল্প ও পরোক্ষরূপে সামাজিক বৈপরীত্যকে প্রকাশ করে।

অ্যাডোর্নো ফ্যাসিবাদী ভাবনা এবং সংস্কৃতির বাণিজ্যীকরণের (তাঁর ভাষায়— Culture Industry বা সংস্কৃতির কারখানা) প্রবল বিরোধী ছিলেন, যার প্রকাশ লক্ষ করা যায় *Dialectics of Enlightenment* (১৯৪৭) গ্রন্থে হর্কহেইমারের সঙ্গে যৌথভাবে), *Minima Morlia* (১৯৫১) এবং *Negative Dialectics* (১৯৬৬) মতো গ্রন্থগুলিতে। এছাড়াও অ্যাডোর্নো রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে

রয়েছে *Introduction to the Sociology of Music, The Authoritarian Personality, The Culture Industry, Prisms* ইত্যাদি। পূর্বেই উল্লেখিত নাৎসিবাদের উত্থানের কারণেই তিনি জার্মানি ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড শহর এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বাস করেন। ১৯৪৯ সালে অ্যাডোর্নো ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি জার্মানির বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১৯৫৫ সালে অ্যাডোর্নো 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চে'র সহ-পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬০ এর দশকে তিনি *Aesthetic Theory* নামে একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কাজ শুরু করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থটি তার জীবনকালে প্রকাশিত হয়নি। বিশিষ্ট দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও সংগীত বিশ্লেষক থিয়োডোর অ্যাডোর্নো ১৯৬৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয় *Aesthetic Theory* নামক গ্রন্থটি।

বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বে অ্যাডোর্নোর অবদান আলোচনা করতে গেলে তিনটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন— মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা, আলোকায়ন (enlightenment) বিষয়ে অ্যাডোর্নোর ভাবনা এবং শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যে সব তাত্ত্বিক ও গবেষকরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা প্রধানত সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডিয় (Freudian) মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে সমাজস্থ ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো কীভাবে নির্মিত হয়েছে, তার প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) তত্ত্ব অত্যন্ত উপযোগী। অন্যদিকে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের তত্ত্বগুলি এইসব কাঠামো ও তার শর্তগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং এগুলি সমাজস্থ ব্যক্তির অভিজ্ঞান নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সুতরাং এই দুই তাত্ত্বিকের তত্ত্ব ভাবনা দুদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। অ্যাডোর্নো তাঁর লেখা, *Sociology and Psychology* প্রবন্ধে বলেছেন যে সামাজিক সমস্যতাকে গভীরভাবে বুঝতে চাইলে একইসঙ্গে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাগুলিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অ্যাডোর্নোর মতে, মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ও সামাজিক বিষয়— এই দুটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে, দুটির নিজস্ব ক্ষেত্রও আলাদা। তবু এই দুটির মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতাও রয়েছে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ যেমন সমাজের অংশ, তেমনই ব্যক্তিমানুষের একটি নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে এই দিক থেকে দেখলে ব্যক্তিমানুষ সমাজ থেকে আলাদা। ফলে প্রত্যেক

মধ্যে মানবিক চিন্তাকে আবদ্ধ করে প্রথানুবর্তিতার (conformism) চেতনাকে লালন-পালন করে। এই ধরনের আদর্শের সামাজিক তাৎপর্য হল এমন এক ধরনের মানসিকতার জন্ম দেওয়া, যা বেশিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য আরোপের জন্যে স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেয়। ফলে একটি প্রশাসিত সমাজ হল আলোকায়িত রীতিনীতির যৌক্তিক ফলশ্রুতি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে এবং পরেও অ্যাডোর্নো নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতির সমালোচনা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। এই বিষয়ে উৎসাহ এসেছিল ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকেই। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বে তাঁর অভিজ্ঞতার জগতে এমন কিছু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে অ্যাডোর্নো এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অন্য গবেষকরা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল শৈলীগুলিকে (patterns) গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উল্লিখিত সুদূরপ্রসারী এবং স্থায়ী পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে— গণমাধ্যমের বিপুল বিকাশ ও বিস্তার, সংস্কৃতি-কারখানার (culture industry) উদ্ভব, নাৎসিবাদ সহ অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রসার, দেশান্তরী হবার মানসিক যন্ত্রণা এবং চলচ্চিত্র ও রেকর্ড-ইন্ডাস্ট্রির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার অভিঘাত। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষকদের মধ্যে অ্যাডোর্নো এবং ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (Walter Benjamin) নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। অ্যাডোর্নোর প্রকাশিত রচনাবলির প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে সংগীত-বিষয়ক। তিনি বেটোফেন, শ্যোয়েনবার্গ প্রমুখ সংগীতকারদের সৃজনশীলতা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি স্যাক্সোফোন ও বেহালার মতো বাদ্যযন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া লুকাচ, কাফকা ও বেকেটের মতো তাত্ত্বিক ও লেখকদের বিষয়ে সাংস্কৃতিক সমালোচনা করেছেন। যেমন অ্যাডোর্নো বলেছেন, বেটোফেনের সংগীত খণ্ড ও সমগ্রতার মধ্যে, বিষয়ীবাদীতা (subjectivity) এবং বিষয়বাদীতার (objectivity) মধ্যে একধরনের ঐক্য গড়ে তোলে। বেটোফেনের সংগীত তার সময়ের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং তা ব্যক্তিতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের সহায়ক ছিল। অ্যাডোর্নো বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্য যদি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা শিক্ষামূলক প্রভাব সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তার গুরুত্ব বিনষ্ট হবে। এই কারণেই তিনি জার্মান নাট্যকার ব্রেখটের (Brecht) সমালোচনা করেছেন, কারণ ব্রেখট প্রকরণের তুলনায় অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। অ্যাডোর্নোর মতে, শিল্প নিজস্ব প্রকরণের সূত্রে ব্যক্তি-মানুষের চেতনার গভীরে অনুপ্রবেশ করে; এক্ষেত্রে বাইরের কোনো নিষ্ক্রিয় ও একমুখী নির্দেশ কাজ করে না। অ্যাডোর্নো 'form' বা

ইউরোপীয় আলোকায়ন (European Enlightenment) প্রকল্পের সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থটি বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিকের সূচনা করেছিল। এর প্রেক্ষিতে ছিল ফ্যাসিবাদী ধারণার বিস্তার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনা এবং নাৎসি আক্রমণের কারণে গবেষণা কেন্দ্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়া। Bronner ও Kellner (১৯৮৯) এর মতে, উক্ত ঘটনাগুলি অ্যাডোর্নো ও হর্কহেইমারকে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রাপথে তাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এমনকি যখন তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন তখনও, এবং মানব-প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অ্যাডোর্নো ও হর্কহেইমারের মূল বক্তব্য ছিল যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদের স্বাধীন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে এবং ক্রমশ প্রকৃতিগতভাবে প্রকরণবাদী ও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। সমাজ জীবনের যন্ত্রণাক্লিষ্ট দিকগুলির বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধানের একটি উপযোগী মাধ্যম না হয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ হয়ে উঠেছে প্রথানুবর্তী (conformist) এবং আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর প্রধান কারণ হল বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং প্রযুক্তি আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির একটি আবশ্যিক অংশ হয়ে উঠেছে— যা শুধু অর্থনৈতিকভাবে অবদমনকারী নয়, তার সঙ্গে অমানবিক প্রবণতাও প্রদর্শন করছে। ফলে অ্যাডোর্নো এই গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা যেমন করেছেন, তার থেকেও বেশি অবিশ্বাস ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আলোকায়নের আদর্শায়িত প্রকল্প রক্ষা করার ব্যর্থতার কারণের জন্য।

মানব সভ্যতাকে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে রক্ষা করার জন্যে আলোকায়নের আদর্শগুলিকে স্বাধীন রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির যৌক্তিক চিন্তা এবং ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারবে বলে ভাবা হয়েছিল। ফলে আলোকায়নের আদর্শের মধ্যেও আধিপত্যবাদের উপাদান প্রোথিত ছিল। অ্যাডোর্নো ও হর্কহেইমারের মতে, আলোকায়িত আদর্শগুলি (enlightened ideals) প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক ধারণা (mythical ideas), যা অযৌক্তিকতার জন্ম দেয়। 'আলোকায়নের দ্বান্দ্বিকতা' বলতে আলোচ্য তাত্ত্বিকদ্বয় এই বিষয়টিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এঁদের মতে, আলোকায়নের রীতিনীতিগুলির বিজ্ঞানবাদী প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে এমন সর্ববিস্তারী যে, তা সব ধরনের অনুভূতি, উৎকর্ষ, বিষয়ীমুখিতা এবং গুণমান থেকে মানুষের জীবন ও চিন্তাভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরিবর্তে তা গণনার প্রযুক্তিগত নীতি, দক্ষতা ও ব্যবস্থানুগতার জ্ঞানের

হারবার্ট মারকুস (১৮৯৮-১৯৭৯)

হারবার্ট মারকুস (Herbert Marcuse) ১৮৯৮ সালে বার্লিনের এক বর্ধিষ্ণু ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বার্লিন ও ফ্রাইবুর্গ (Freilburg) বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এডমন্ড হুসারল (Edmund Husserl) ও মার্টিন হাইডেগারের (Martin Heideger) মতো দার্শনিকদের ওপর তিনি দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করেছেন। আমাদের আলোচনার প্রাথমিক পর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হারবার্ট মারকুস ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ও বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন। অন্যান্য তাত্ত্বিক ও গবেষকের মতো নাৎসি আক্রমণের সময় তিনিও জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ' নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে মারকুস এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আর জার্মানিতে ফিরে যাননি। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও তারপরে তিনি হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে ব্র্যান্ডিস (Brandeis) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে ১৯৪১ সালে মারকুস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ 'Office of Secret Services'-এ যোগ দিয়েছিলেন এবং সক্রিয় ভাবে তিনি এই কাজে যুক্ত ছিলেন।

মারকুসের লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় *One-dimensional Man*'-এর মতো জনপ্রিয় গ্রন্থের কথা। এছাড়াও, মারকুস আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা, যেমন— *Reason and Revolution (1941), Eros and Civilization (1955) and Negation : Essays in Critical Theory (1968), Five Lectures (1970)।*

মারকুস ছিলেন সুলেখক, সুবক্তা এবং একজন বিদ্বান মানুষ। তবে উল্লেখ্য যে তাঁর বাগ্মিতা ১৯৬০ এর দশকে নব্য বামপন্থী আন্দোলনে (New Left Movement) তাঁকে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল।

দীর্ঘ একাশি বছর জীবৎকালে মারকুস বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে দর্শন ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে মার্কসীয় চিন্তাকে কখনও সমর্থন করেছেন, সমালোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং সর্বোপরি

জীবন সম্পর্কিত প্রবৃত্তিগুলি জীবিত উপাদানগুলিকে আরও বেশি পরিমাণে স্থায়ী একক সমূহের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। অন্যদিকে, মৃত্যু বিষয়ক প্রবৃত্তি বা যন্ত্রণা কিংবা চাহিদা ছাড়াই মানুষের মধ্যে জন্মের আগেকার অবস্থায় ক্ষণাবস্থায় ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কিত প্রবৃত্তি জীবন-সম্পর্কিত প্রবৃত্তির বশে চলে আসে। এরই ফলশ্রুতিতে নেতিবাচক শক্তিগুলি (ধ্বংসাত্মক) দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একদিকে বাহিত হয়— তা প্রবাহিত হতে পারে বাইরের বিশ্বের দিকে (Socially useful agression রূপে), কিংবা তা মানুষের অন্তর্গত শক্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে। যৌনতা (Eros) আনন্দের সন্ধান করে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে প্রবৃত্তিগুলি যে সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি চায়, তাকে মেটানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত *Five Lectures* গ্রন্থে মারকুস দেখিয়েছেন যে মানসিক অবস্থার গতিশীলতা তিনটি শক্তির প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে— (১) ভালোবাসা, যৌনতার প্রবৃত্তি (Eros), (২) মৃত্যু বিষয়ক প্রবৃত্তি (Thaneatos) এবং বাস্তব শর্তসমূহ। এই তিন ধরনের শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যে তিনটি নীতি গড়ে ওঠে সেগুলিই মানসিক সক্রিয়তাকে শাসন করতে থাকে। এই তিনটি নীতি হল—(১) আনন্দের নীতি, (২) নির্বাণের নীতি এবং (৩) বাস্তবতার নীতি। মারকুস বলেছেন, আধুনিক সভ্যতার দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে আনন্দের নীতি ও বাস্তবতার নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো সম্ভব। এছাড়া, নতুন চেতনা ও বোধসম্পন্ন সমাজ যতই বিকশিত হবে— জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব ততই হ্রাস পাবে। মারকুস বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন, সৃষ্টি, ভালোবাসা ও যৌনতা বিষয়ক প্রবৃত্তি (Eros) মৃত্যু বিষয়ক প্রবৃত্তিকে (Thanatos) নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এইভাবে আত্মীকৃত করতে সক্ষম হবে।

হারবার্ট মারকুস গোঁড়া মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু মার্কসীয় প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে মার্কস ছাড়াও জর্জ হেগেলের (Georg Hegel) দ্বান্দ্বিকতাও মারকুসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জর্জ লুকাচের সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় চিন্তায় হেগেলকে পুনরাবিষ্কার করতে সহায়ক ছিলেন। হেগেলের মতো তিনি যুক্তির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের (Immanuel Kant) তত্ত্বের প্রতি হেগেলের বিরোধিতা তাকে পরিতৃপ্তি দিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে 'things-in-themselves' বা 'বস্তু নিজস্ব অবস্থায়' যদি যুক্তির নিয়ন্ত্রণের

সামাজিকীকরণের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারের ভূমিকা পরিবর্তনের ফলে গণমাধ্যম প্রধান মাধ্যমের ভূমিকা অর্জন করেছে। সমাজস্থ ব্যক্তির মন এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে গণমাধ্যম ও এই নিয়ন্ত্রণ এমন যে তা ব্যক্তির স্বাধীনতা তথা উদ্যোগকে আচ্ছন্ন ও খর্ব করতে সক্ষম। ফলে গণমাধ্যমের দ্বারা যে তথ্য ও বিনোদন সরবরাহ করা হচ্ছে, তা ব্যক্তিকে অনড় ও অনুভূতিহীন করে দিচ্ছে। উন্নত শিল্প সমাজগুলি তাই প্রকৃত অর্থে বিচ্ছিন্ন এবং এই সমাজগুলি সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি-নির্ভর। প্রযুক্তি-নির্ভর যৌক্তিকতা-ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলি মানুষের মধ্যে চাহিদা তৈরি করে— যার ফলশ্রুতিতে মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিরোধমূলক চিন্তা হ্রাস পায়। এইজন্য মানুষ তার কর্মে ও চিন্তায় হয়ে ওঠে 'One-dimenstional' বা 'এক-মাত্রিক'। সমাজে অবদমিত প্রযুক্তি বিনোদন ও আনন্দের উপাচার সামনে রেখে ক্রিয়াশীল হয়। তাই মানুষকে 'সুখী' করার লক্ষ্য নিয়ে এ হল এক ধরনের প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করার মতো তার নিজস্ব ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে।

আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে প্রযুক্তি কখনোই নিরপেক্ষ নয়। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সংগঠিত যৌক্তিকতার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে, এটি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আপাতভাবে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ হবার ইঙ্গিত দেয় এবং এইভাবে মানুষের মনকে অধিকার করার কাজে আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে মানুষের সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তিকে অবদমন করতে চায়। অবশ্য এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে মারকুস প্রযুক্তিকে বিনষ্ট করার কথা ভেবেছেন। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে প্রযুক্তি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই বিষয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন। মারকুসের (১৯৬৮) নিজের ভাষায়, "Technology, no matter how 'pure', sustains and streamlines the continues of domination. This fatal link can be cut only by a revolution which makes technology and technique subservient to the needs and goals of free men"।

প্রযুক্তিগত যৌক্তিকতার ধারণাকে সমালোচনা করে মারকুস পুঁজিবাদী মার্কসীয় সমালোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করার বিষয়ে তাঁর সহমত প্রদর্শন করেছেন এবং এর মধ্যে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবারের যুক্তিবাদিতার ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। ক্রমবর্ধমান যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া আধুনিক সমাজে যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তা সমাজ জীবনকে ক্রমশ বিধিনিষেধের নাগপাশে বদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে। আধুনিক সমাজকে যতই যৌক্তিক ভিত্তির ওপর

সামাজিকীকরণের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারের ভূমিকা পরিবর্তনের ফলে গণমাধ্যম প্রধান মাধ্যমের ভূমিকা অর্জন করেছে। সমাজস্থ ব্যক্তির মন এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে গণমাধ্যম ও এই নিয়ন্ত্রণ এমন যে তা ব্যক্তির স্বাধীনতা তথা উদ্যোগকে আচ্ছন্ন ও খর্ব করতে সক্ষম। ফলে গণমাধ্যমের দ্বারা যে তথ্য ও বিনোদন সরবরাহ করা হচ্ছে, তা ব্যক্তিকে অনড় ও অনুভূতিহীন করে দিচ্ছে। উন্নত শিল্প সমাজগুলি তাই প্রকৃত অর্থে বিচ্ছিন্ন এবং এই সমাজগুলি সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি-নির্ভর। প্রযুক্তি-নির্ভর যৌক্তিকতা-ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলি মানুষের মধ্যে চাহিদা তৈরি করে— যার ফলশ্রুতিতে মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিরোধমূলক চিন্তা হ্রাস পায়। এইজন্য মানুষ তার কর্মে ও চিন্তায় হয়ে ওঠে 'One-dimenstional' বা 'এক-মাত্রিক'। সমাজে অবদমিত প্রযুক্তি বিনোদন ও আনন্দের উপাচার সামনে রেখে ক্রিয়াশীল হয়। তাই মানুষকে 'সুখী' করার লক্ষ্য নিয়ে এ হল এক ধরনের প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ সমালোচনা বা বিশ্লেষণ করার মতো তার নিজস্ব ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে।

আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে প্রযুক্তি কখনোই নিরপেক্ষ নয়। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সংগঠিত যৌক্তিকতার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে, এটি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আপাতভাবে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ হবার ইঙ্গিত দেয় এবং এইভাবে মানুষের মনকে অধিকার করার কাজে আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে মানুষের সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তিকে অবদমন করতে চায়। অবশ্য এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে মারকুস প্রযুক্তিকে বিনষ্ট করার কথা ভেবেছেন। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে প্রযুক্তি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই বিষয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন। মারকুসের (১৯৬৮) নিজের ভাষায়, "Technology, no matter how 'pure', sustains and streamlines the continues of domination. This fatal link can be cut only by a revolution which makes technology and technique subservient to the needs and goals of free men"।

প্রযুক্তিগত যৌক্তিকতার ধারণাকে সমালোচনা করে মারকুস পুঁজিবাদী মার্কসীয় সমালোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করার বিষয়ে তাঁর সহমত প্রদর্শন করেছেন এবং এর মধ্যে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবারের যুক্তিবাদিতার ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। ক্রমবর্ধমান যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া আধুনিক সমাজে যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তা সমাজ জীবনকে ক্রমশ বিধিনিষেধের নাগপাশে বদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে। আধুনিক সমাজকে যতই যৌক্তিক ভিত্তির ওপর